১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৪১৪ ★ Vol-I Issue-IV December 2007 ১৫ টাকা

দিনের শেষে

বাংলা মাসিক পত্রিকা

ক্ষমতা তুমি দূরে সরে থাকো,
ক্ষমতা তুমি পাথর ছুড়ো না,
ক্ষমতা তুমি পথরোধ করো না,
ক্ষমতা তুমি ভালোবাসতে শেখো,
ক্ষমতা পারোতো মানুষ হও,
ক্ষমতা তুমি মানুষ হও, মানবিক হও।

"এ কোন সকাল ..... রাতের চেয়েও অন্ধকার"

লক্ষ্মী — দেবী থেকে মানুষ হল

– রুমনা চ্যাটার্জী
(বেঙ্গালুরু)

বয়স মাত্র দুবছর। গ্রামবাসীরা তার পূজো করতেন। সার্কাস মাফিক এসে তাকে কিনে নিতে চাইত। মা-বাবা আতঙ্কে ভুগতেন। বিহারের আরহারিয়া গ্রামের নিবাসী শম্ভু ও পুনম তাতমার মেয়ের কোমরের পরেই ছিল বাড়তি দুটো হাত ও দুটো পা। স্থানীয় চিকিৎসকেরা সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন যে লক্ষ্মী কোনদিনই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। শয্যাশায়ী হয়েই কাটাতে হত লক্ষ্মীকে, কতদিন বাঁচবে তার নিশ্চিয়তাও ছিল না। মায়ের গর্ভে বড় হওয়ার সময় লক্ষ্মীর সঙ্গে ছিল যমজ ভ্রূণ। এই ভ্রূণটি নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু লক্ষ্মীর শিড়দাঁড়ার সঙ্গে জুড়ে যায়। গোটা ভ্রূণটির আবার বৃদ্ধি হয়, ফলে লক্ষ্মীর হাত পায়ের সংখ্যাও শরীরের অভ্যন্তরেও অঙ্গ বাড়তে থাকে।

শম্ভু - পুনমের মেয়েকে নিয়ে গ্রামে কৌতুহলের শেষ ছিল না। গ্রামবাসীদের ধারণা ছিল স্বএং লক্ষ্মীদেবীই পুনমের গর্ভে জন্ম নিয়েছেন। গোটা তল্লাটে চলত পূজো-আচ্চার ধুম। দিল্লির এক সার্কাস মালিক খবরটা শুনে দৌড়ে এসেছিল, মোটা টাকার বিনিময়ে লক্ষীকে কিনতে,— শম্ভু-পুনম রাজী হয়নি। অবস্থা এমন জায়গায় এসে পৌছেছিল যে আতঙ্কিত মা-বাবা দরজা বন্ধ করে দিন কাটাতেন। হঠাৎ এই খবর জানতে পেরে লক্ষ্মীর মা-বাবার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন চিকিৎসক শরন পাটিল। তিনি মা-বাবাকে অভয় দেন যে বিনা পয়সায় তাঁদের মেয়ের অস্ত্রোপচার করবেন তাঁরা।

চিকিৎসক শরন পাটিলের কথায় আশ্বস্ত হয়ে অস্ত্রোপচারের জন্য, রাজী হন শম্ভু ও পুনম। বেঙ্গালুরুতে ৬ নভেম্বর শুরু হয় এক ম্যারাথন অস্ত্রোপচার। ৩৬ জন চিকিৎসক পালা করে ছিলেন অপারেশন থিয়েটারে। এঁদের মধ্যে ছিলেন অস্থি বিশেষজ্ঞ, প্লাস্টিক সার্জন, স্নায়ু বিশেষজ্ঞ, শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। বেঙ্গালুরুর হেল্‌থ সিটির স্পর্শ হাসপাতালে জয় হল চিকিৎসা বিজ্ঞানের। চিকিৎসক শরণ পাটিল সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন অপারেশন দুর্দান্ত ভাবে সফল এবং এই অপারেশন করে ডাক্তারেরাও রীতিমতো গর্বিত। ডাক্তারেরা আশা প্রকাশ করেছেন যে লক্ষ্মী ভবিষ্যতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে। ডাক্তারদের গর্বের কারণ আছে — ভারতে এ ধরনের অস্ত্রোপচার এই প্রথম। এই অস্ত্রোপচার ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন মাত্রা যোগ করল বলে মনে করছেন দেশের চিকিৎসক মহল।

৬ নভেম্বর সকাল ৭টা থেকে ৭ নভেম্বর সকাল দশটা পর্যন্ত মা-বাবা দু চোখের পাতা এক করেননি। অপারেশন থিয়েটারের বাইরে বসে শুধু কেঁদেছেন আর প্রার্থনা করেছেন। আর অপারেশন থিয়েটারের ভেতরে চলেছে ২৭ ঘন্টা ধরে একটানা ম্যারাথন অপারেশন। ৭ নভেম্বর সকাল দশটার পর মা-বাবার মুখে হাসি ফুটল যখন জানলেন যে তাঁদের মেয়ে দেবী থেকে মানুষ হয়েছে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক অসামান্য সাফল্যে।

লক্ষ্মীর মতো 'ইশ্চিয়োফেগাস (প্যারাসাইটিক) কনজয়েন্ড টুইন' পৃথিবীতে বিরল, ৪' লক্ষ শিশু জন্মালে এক জন এমন হয়। এমন যমজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মেয়ে হয়। একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু থেকেই দুটি ভ্রূণ তৈরি হয়। পরে একটি ভ্রূণ নষ্ট হলে অন্যটি পরজীবী যমজ (প্যারাসাইট টুইন হিসেবে) বাড়তে থাকে। এই যমজের মাথা থাকে একটি, কিন্তু হাত-পা হয় চারটি করে। এই প্যারাসাইট বা পরজীবী শরীরটিকেই লক্ষ্মীর দেহ থেকে বাদ দেওয়া হল।

প্রথমে এক দল শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ সার্জন লক্ষ্মীর বাড়তি কিডনি বাদ দিয়ে তার নিজস্ব দু'টো কিডনি আলাদা করেন। স্নায়ুবিশেষজ্ঞেরা তার মেরুদণ্ড থেকে ওই পরজীবী দেহের সুষুম্নাকাণ্ডটিকে নিখুঁত ভাবে পৃথক করে দেন। অস্ত্রোপচারের এই পর্যায়টি ছিল অত্যন্ত জটিল। পরজীবী দেহটির যাবতীয় কোষকলা, শিরা-ধমনী খুব সাবধানে আলাদা করতে হয়েছে। ছোট্ট শরীর থেকে যাতে যথাসম্ভব কম রক্ত বেরোয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হয়েছিল। এর সঙ্গে লক্ষ্মীর যৌনাঙ্গ দেহের জায়গামতো আনা হয়। অস্থিবিশারদেরা তার কোমরের জোড়ন (পেলভিক গার্ডল) ঠিক করেন, বাদ দেন অতিরিক্ত দু'টি করে হাত-পা। প্লাস্টিক সার্জারি করা হয় সব শেষে। এই সাতাশ ঘন্টা টানা লড়াই করেন ৩৬ জন ডাক্তার। মোট খরচ হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা, যার এক পয়সাও লক্ষ্মীর বাবা-মাকে দিতে হয়নি। বিহারের নেপালঘেঁষা অরেরিয়াজেলার রামপুর কোডারকুট্টির বাসিন্দা ঠিকা শ্রমিক শম্ভু এবং তাঁর স্ত্রী পুনম ভাবতেই পারেননি, তাঁদের মেয়ে লক্ষ্মী এ ভাবে সুস্থ হওয়ার পথে এগোবে। গ্রামের লোক শম্ভুকে বলেছিল, লক্ষ্মীর চার হাত - পা ভগবানের দান, সে দেবী। সেগুলো বাদ দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু তাদের এড়িয়ে শরণ পাটিলের কথায় বেঙ্গালুরু পাড়ি। গত এক মাস মেয়েকে নিয়ে সংসার পেতেছিলেন হাসপাতালেই।

এ কোন সকাল !

রাতের চেয়েও .....

অন্ধকার

সিদ্ধার্থ রায় ও অনির্বাণ ঘোষ

একদিকে সাধারণ মানুষ আর অন্যদিকে হিংস্র হায়নার দল। ঝাপিয়ে পড়েছে বন্দুকের নলে বশ্যতা স্বীকার করানোর জন্য প্রতিবাদী মানুষদের উপরে। নিহত হয়েছেন বহু সাধারণ মানুষ, আহত হয়েছেন অগণিত। ঘর ছেড়ে হাজার হাজার মানুষ, সহায় সম্বলহীন মানুষ পালাচ্ছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। এ দৃশ্য মনে করিয়ে দেয় কোন যুদ্ধের সেই চিরচরিত ছবি। হানাদার হায়নার দল তাদের মর্জি মত দখল করে নিচ্ছে গরিবদের জমি, কেড়ে নিচ্ছে বাড়ি, পুড়িয়ে দিচ্ছে কৃষকের ধানের গোলা, লুট হচ্ছে গরু-বাছুর ও চালাচ্ছে গণহত্যা - গণধর্ষণ। এটাই হল আজকের পশ্চিমবাংলার নন্দীগ্রামের চিত্র। নেতারা বলেছেন, নন্দীগ্রাম বাসীদের শায়েস্তা করতে যুদ্ধ করতে হবে। যারা গলা ফাটিয়ে এতকাল চেঁচাতেন বাক স্বাধীনতার জন্য, আজ তারাই প্রতিবাদকে টুটি টিপে শেষ করে দিতে চাইছে জল্লাদের আচরণে ! স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও এক রাজ্যে চলছে এরকম লজ্জাজনক প্রক্রিয়া, কারণ এটাই নাকি সি পি এমের বিপ্লবের নামে রণকৌশল।

কমিউনিষ্ট শাসন বলতে যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা নয়, একথা নন্দীগ্রামের অবস্থা প্রমাণ করে দিয়েছে। বিগত ১১ মাস ধরে নন্দীগ্রামে তাণ্ডব চলতে দেওয়া হল। অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা ! পুলিশ নাকি ঢুকতেই পারল না। ইচ্ছাকৃত ভাবে পুলিশ প্রশাসনকে সরিয়ে রেখে সি পি এমের সশস্ত্র গুন্ডারা হত্যালীলা চালাল। পরিকল্পিত এই তাণ্ডব চালানোর আগে নন্দীগ্রামে যত পুলিশ ক্যাম্প ছিল, খালি করিয়ে দেওয়া হোল। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সি আর পি এফও যাতে হত্যালীলা ও গ্রাম দখলের আগে না ঢুকতে পারে সেজন্য ক্যাডার দিয়ে বাধা সৃষ্টি করা হল। শাসক দলের এই ভয়াবহ চেহারা গুজরাতের দাঙ্গার দিনগুলিকে আবার মনে করিয়ে দিল। নন্দীগ্রাম দখলের মরিয়া খেলায় ভাড়াটে গুণ্ডা এনে আন্দোলনকারীদের সম্পূর্ণভাবে নির্মুল করার যে মহান বৈপ্লবিক অভিযান সি পি এম চালাল, তা প্রমাণ করল যে অপশাসন, পক্ষপাত, নির্লজ্জতা, বিভৎসতা ও মিথ্যাচারের প্রতিটি সীমা ছাড়িয়ে এরা কতটা নীচে নামতে পারে।

এরকমই যে ঘটবে তার সংকেত অনেক দিন ধরেই দিয়ে আসছিলেন সি পি এম নেতারা। বোঝা যাচ্ছে যে ক্ষমতা ধরে রাখতে তাঁরা গৃহযুদ্ধও বাধাতে পারেন। রেশন নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারা রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন হয়েছে তা দমন করার জন্য পার্টির ভিতর চলছে গভীর প্রস্তুতি। বর্ধমানে মহামিছিল বার করে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে 'প্রতিবিপ্লবী'আখ্যা দিয়ে সি পি এমের ঠ্যাঙারে বাহিনী হাতে লাঠি, টাঙি, রামদা নিয়ে জনসাধারণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করল। প্রকাশ্যে স্থানীয় নেতারা বললেন যে আমরা আর পুলিশ ব্যবহার করব না, জনগণই হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে। এই জনগণ কারা এবং নিজেদের ক্যাডারদের জনগণ বলে জনগণকে অপমান করার এই জঘন্য প্রবৃত্তি কিন্তু ফ্যাসিস্টদের চরিত্রের এক বিশাল চতুরতা। এই নির্লজ্জ চতুরতা নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী ও পুলিশমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও তাঁর ঘনিষ্ঠ শাকরেদ — বিমান বসু, বিনয় কোঙার, সুশান্ত ঘোষ, লক্ষ্মণ শেঠ ও অশোক গুড়িয়া তৈরি করেছিলেন নন্দীগ্রাম পুনর্দখল করার জন্য গণহত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের পরিকল্পনা। এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে যে ফ্যাসিবাদী শ্রেণী চরিত্র ছিল, আজ তা উন্মোচিত হয়ে গেছে।

এক অভদ্র, পাশবিক ও বীভৎস খেলায় মগ্ন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী যে এতবড় বেহায়া ও অশিক্ষিত গুন্ডাদের মত কথা বলতে পারেন তা আমাদের জানা ছিল না। মহাকরণে বসে

মুখ্যমন্ত্রী যে কোনও দলের হয়ে কথা বলতে পারেন না, এই বোধবুদ্ধি টুকুও হারিয়ে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতিমনস্ক বলে পরিচিত এই নির্লজ্জ মানুষটি । নন্দীগ্রাম দখলের পর মহাকরণে দাড়িয়ে স্পষ্ট ঘোষণা করলেন — "দে আর পেড ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েন্স ।" পাড়ার রকবাজ দাদারা আর মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে কোনো পার্থক্য আর নেই । গণতান্ত্রিক অধিকার কি শুধু সি পি এম ক্যাড়ারদের জন্য ? মুখ্যমন্ত্রী কি জবাব দিতে পারবেন যে দলে দলে যদি বাইরে থেকে আনা সি পি এম কর্মীরা নন্দীগ্রামে ঢুকতে পারে । তাহলে মিডিয়া ও অন্য ব্যক্তিদের ঢুকতে দেওয়া হল না কেন ? বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও সি পি এম ক্যাডারদের এই অধিকার কে দিয়েছে যে তারা ইচ্ছামতো লালা ঝান্ডা তুলে বিরোধি পক্ষের যাতায়ত, মিডিয়ার প্রবেশে অবরোধ সৃষ্টি করবে ? বেপরোয়া ভাবে ভাড়াটে খুনিরা নিরস্ত্র বিক্ষোভকারীদের উপর তাণ্ডব চালালো আর সেই দৃশ্য যাতে কোনো মিডিয়া ক্যামেরা বন্দি না করতে পারে তার জন্যই কি এই ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ ? পশ্চিমবঙ্গের আর এক দাদা বিমান বসু নন্দিগ্রাম দখলের পর জানালেন যে "নন্দীগ্রামে নতুন সূর্য্য উঠেছে"। আশ্চর্য এই পৈশাচিক মনোবৃত্তির মানুষটি । দলের বন্দুকবাজরা নিরস্ত্র শরণার্থী মিছিলের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে একটি গ্রামকে শ্মাশানের পরিণত করে বলছেন নতুন সূর্য্য ওঠার কথা । ধন্য হে মার্কসবাদের কর্ণধারেরা । তোমাদের কাছে শ্মশানের শান্তিই হোলো আসল শান্তির লক্ষ্য !

আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত । যারা সি পি এম সমর্থক তাদের স্থান মুখ্যমন্ত্রীর কাছে 'আমরা' বলে আর যারা সি পি এম বিরোধী তারা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় 'ওরা' । সেই 'ওরা' দের সায়েস্তা করতে নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা দেখে সারা দেশ স্তম্ভিত । নৃশংসভাবে হত্যালীলা চালানো হয় নন্দীগ্রামে । নিরস্ত্র মানুষদের অপহরণ করে হাত বেঁধে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা হয় সোনাচূড়া ও গড়চক্রবেড়িয়া দখলের সময় । এই নৃশংস হত্যালীলা চাপা দিতে অনেক মৃতদেহ অ্যাম্বুলেন্স ও মোটরগাড়ি করে সকলের অলক্ষ্যে পাচার করা হয় । কিন্তু বুদ্ধদেবের এই নোংরামো ও ভণ্ডামি ধরা পরে যায় খেজুরি ফেরতা ছোট আঙারিয়া গণহত্যার দুই প্রধান আসামি তপন ঘোষ ও সুকুর আলির ধরা পড়াতে । এই দুই ঘাতকদ্বয় ধরা পড়ে ঠিক তখনই যখন তারা গাড়ি করে মৃতদেহ পাচার করছিল । অভিযোগ অন্যান্য দলীয় নেতাদের গাড়িতেও নন্দীগ্রাম থেকে আন্দোলনকারীদের দেহ পাচার করা হয় । সরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা 'নগণ্য' বলে চালানোর কি ঘৃণ্য প্রয়াস। ভাগ্যের পরিহাসে নন্দীগ্রামে সবসময় রাজ্য সরকার মাওবাদীদের বিরাট ভূমিকা দেখেন কিন্তু আজ পর্যন্ত পুলিশ একটি মাওবাদীকে ধরতে পারেনি, উপরন্তু জনরোষের চাপে এমন দুজনকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হল যাদের বিগত সাত বছর ধরে সরকার আড়াল করে আসছিল "খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে"।

এগারো মাস ধরে নীরব, কোনও রাজনৈতিক বা

প্রশাসনিক বিকল্প অনুসরণ না করে হঠাৎ এক নতুন পাশার চালে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে, ঠ্যাঙাড়ে গুণ্ডাদের জড়ো করে, ক্যাডার দিয়ে প্রবেশপথ অবরুদ্ধ করে ন্যায়, নীতি ও গণতন্ত্রের হত্যা করা হল । হতভাগ্য শরণার্থীদের আর্তনাদে আজ নন্দীগ্রামের আকাশ-বাতাস মুখরিত । শাসক দলের কর্তারা আগেও বহুবার স্বীকার করেছেন যে নন্দীগ্রামে বিরোধীদের কোনও অস্তিত্বই ছিল না । একথা আজ প্রমাণিত যে সি পি এমের বিশ্বস্ত অনুগামীদের এক বড় অংশ নন্দীগ্রামে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন । বিদ্রোহ ঘোষণা করায় তাই তারা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায় 'ওরা' হয়ে গেছেন, এবং ঐ 'ওরা'দের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে, রক্তগঙ্গা বইয়ে প্রতিশোধ নেওয়া হল, এটাই হল 'শ্রেণীসংগ্রামের' নতুন সংযোজন । আজ বুদ্ধদেবের উন্নয়ন মানে হল প্রতিদিন গরিব মানুষদের মধ্যে সংঘাত বাধানো, মানুষের রক্ত ঝরানো আর সন্ত্রাসের রাজত্ব চালানো । স্বয়ং রাজ্যপাল নন্দীগ্রামের ঘটনাকে প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়ে ধিক্কার জানিয়েছেন । এক অপদার্থ ও ভণ্ড নেতা বিমান বসু রাজ্যপালের বক্তব্যকে সংবিধানের আওতার বাইরে বলে চেঁচামেচি করলেন । সংবিধানের আওতায় পড়ে কি পড়ে না জানি না কিন্তু যাঁরা মানবিকতার কথা এখনও ভুলে যাননি তাঁদের মনে এ নিয়ে কোনো সংশয় হবে না যে গোপাল কৃষ্ণ গাঁধী যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য ।

কোর্ট যদি গুজরাতের ব্যাপারে মন্তব্য করে কিংবা বিরোধিদের ব্যাপারে কোন রায় দেন তখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, দিল্লিতে বসে থাকা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকেও সি পি এম নেতারা বেরিয়ে এসে কত না লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেন ।

আজ কি ভাবছেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবি মানুষেরা ? যাঁরা চিরকাল পশ্চিমবঙ্গের সাথে অন্য রাজ্যের তুলনা করে একথা বোঝাতে ব্যস্ত থাকতেন যে সবচেয়ে নিরাপদ ও আইন শৃঙ্খলার স্বর্গরাজ্য হল পশ্চিমবঙ্গ । আজ আপনারা চেয়ে দেখুন একনায়কতন্ত্রের কি বীভৎস ও কাপুরুষতার এক নগ্ন প্রদেশে আপনাদের অবস্থান, সেখানে সত্যি কথা বলার অধিকারও আপনাদের নেই । সত্যি কথা বললেই আপনারা 'ওরা' হয়ে যাবেন আর শাসক দল বেয়াড়াদের শায়েস্তা করতে হবে বলে আপনাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে প্রতিশোধ নেবে । চেয়ে দেখুন দাম্ভিকতায় টইটম্বুর আপনাদের শাসক দলের চেহারা, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জায়গা নিজেদের দখলে রেখে তবেই শান্ত হবেন নতুবা নয় । খেলার মাঠই হোক বা চলচিত্রের মঞ্চ, নাট্যকর্মীই হোন বা স্কুলের শিক্ষক, সিঙ্গুর - নন্দীগ্রামই হোক বা অর্থশাস্ত্রের প্রোফেসার প্রতিটি ক্ষেত্রেই এদের জয়গান গাইতে হবে নইলে পশ্চিমবঙ্গে আপনার ঠাঁই হবেনা ! নন্দীগ্রামে 'সম্পূর্ণ শান্তি'র ব্যবস্থা করে এবার কাপুরুষ সি পি এমের দালালেরা শহরে ও শহরতলীর পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করবেন কিংবা বই বিলি করবেন যে - "বিরোধীরা কি ভয়ানক চক্রান্ত করেছিল"। পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবি মানুষেরা আপনারা নিজেদের সচেতন ও দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে পরিচিতি দেন, কিন্তু আপনারা কি ভুলে গেছেন সেই সত্তরের দশকের কথা ? ঠিক তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলছে সে কথা কি বুঝতে পারছেন ? বিপ্লবের নামে কেমন চোরাগোপ্তা ভাবে ঘুঘুর বাসা তৈরী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন ? যে অশোক টোডিকে নিয়ে আজ এত কথা জানা যাচ্ছে, সেই অশোক টোডিই কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর কোটা থেকে সল্টলেকে আটখানা প্লট পেয়েছিলেন । তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ছেলে চন্দন বসুর সঙ্গে কলকাতার একই চত্বরে অশোক টোডিরও ব্যবসা আছে এবং সেকথা একটি রিপোর্টেও প্রকাশ পেয়েছে । বিপ্লব করতে গিয়ে কত নোংরা মানুষদের সাথে ওঠাবসা করতে হয় তাই নয় কি ? এই অশোক টোডি কলকাতা পুলিশকে ৮০০টি গেঞ্জি উপহার দিয়েছিলেন, তাই পুলিশ তাঁর হয়ে কথা না বললে প্রতিবিপ্লবীর পর্যায়ে শামিল হওয়া নয় কি ?

বিপ্লবের স্বার্থে কত কিছুই না করতে হয় । ১৯৭৭-এর ২১ জুন বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল কংগ্রেসের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের পর । আজ সেই কংগ্রেসের সাথেই গলায় গলায় পিরিত। কংগ্রেসের অবস্থা শিখণ্ডীর মত, তাই পশ্চিমবঙ্গে কৃষকরা মরুক, শ্রমিকেরা না খেতে পেয়ে আত্মহত্যা করুক আর আইন ভেঙ্গে সি পি এম ক্যাডার দিয়ে শাসন চালাক কিংবা আইনসিদ্ধ বিয়ে ভেঙ্গে দিক — গদীর মোহে কংগ্রেস যে কিছু করবেনা একথা সর্বজনবিদিত । ঠিক এভাবেই সি পি এম মিডিয়ার একটি অংশকে কিনে নিয়েছে, পুলিশের লাঠি ক্যাডাররা ব্যবহার করছে আর ঘুষখোর সাংবাদিকরা সত্য ঘটনাকে লোপাট করে ষড়যন্ত্র বলে নানা ধরনের অসত্য সংবাদ পরিবেশনায় মগ্ন । কিন্তু যারা ঘুষ খাচ্ছেন না তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন সরকার । মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী এক সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণির বাংলা দৈনিকের সাংবাদিককে সরাসরি মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন — "জনগণের প্রতিনিধি কি আপনারা ? না আমি ? আমি ৩৫ বছর ধরে নির্বাচিত জন প্রতিনিধি ! আপনারা কোথাকার কে ? আজ আছেন কাল নেই"। এখানেই থেমে থাকেননি সুভাষবাবু, এক চ্যানেলকে জানিয়ে দিয়েছেন যে -"একবার রাস্তায় আনন্দবাজার পোড়ানো হয়েছিল সেটা যেন তাঁরা মনে রাখেন"। অসাধারণ মন্তব্য ! এ কথা কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ণধারেরা না বললে কি বিপ্লব হয়? সি পি এমের বিপ্লবী নেতা ও ছিনতাইবাজদের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে কি ?

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব বাবুর ভাষাটা ছিল একটু অন্যরকমের

তবে মুখ্যমন্ত্রী হয়ে এরকম কথাটা যে কতটা বেমানান তা বুদ্ধিজীবীরাই বিচার করে দেখবেন । মহাকরণে বুধবার ১৪ই নভেম্বর যখন এক সাংবাদিক প্রশ্ন তোলেন যে - তিনি যেভাবে সি পি এমের গ্রাম দখলকে সমর্থন করছেন, তাতে অনেকে মনে করছেন, এতে নন্দীগ্রামে অশান্তিকেই উস্কে দেওয়া হল । তিনি কি বলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে মূখ্যমন্ত্রী সাংবাদিককে বলেন — "সকলে মনে করছে না । ওটা আপনার কাগজ মনে করছে । আপনারা যা ইচ্ছে লিখুন । আমার তাতে কিছু যায় আসে না ! আপনারা তো ১১ মাস ধরে উস্কানি দিয়ে চলেছেন। অন্য কোন সরকার হলে ব্যবস্থা নিত । আমি নিইনি। কারণ ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চাই না ।" এবার প্রশ্ন হল বুদ্ধবাবু কার কার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন । নন্দীগ্রামে ১৪ই মার্চ এর ঘটনাকে কালকাতা হাইকোর্ট অসংবিধানিক বলে আখ্যা দিয়েছেন । মৃত ও আহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ ছাড়াও সি বি আইকে ১ মাসের ভেতর তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছেন । এই রায় বের হওয়ার পর প্রকাশ্যে বিমান বসু টিভি চ্যানেলের সামনে বললেন "সব কিছুতেই তো কোর্ট ঢুকে পড়েছে, এখন তারাই ঠিক করবেন সরকার কি ভাবে চলবে"। আশ্চর্য বিবৃতি ! সি পি এম বেয়াদপি করবে, গণহত্যা, গণধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের কুকীর্তিগুলি করবে কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারবেন না কারণ ওনারা সর্ব্বহারাদের নাম করে বিপ্লব করছেন আর পার্টিতন্ত্রের ডান্ডা দিয়ে প্রতিটি প্রতিবাদকে নিশ্চিহ্ন করবেন, এটা যে ওনাদের শ্রেণী সংগ্রাম ! আর যারাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন তাঁরা প্রতিবিপ্লবী । নরেন্দ্র মোদী, জেনারল মুশারফ, জর্জবুশের কায়দায় এরা চাইছেন শান্তি ফেরাতে ! মানে রাজ্য জুড়ে থাকবে শুধু শ্মশানের শান্তি।

কোর্ট যদি গুজরাতের ব্যাপারে মন্তব্য করে কিংবা বিরোধিদের ব্যাপারে কোন রায় দেন তখন শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন, দিল্লিতে বসে থাকা শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর থেকেও সি পি এম নেতারা বেরিয়ে এসে কত না লম্বা চওড়া বক্তৃতা দেন । গর্জে লাফিয়ে ও অস্ফালন করে বলে ওঠেন অমুককে ইস্তফা দিতে হবে, তমুককে গ্রেপ্তার করতে হবে কারণ, গণতন্ত্রের হত্যা আমরা সহ্য করব না ইত্যাদি । কিন্তু যেই হাইকোর্ট সি পি এমের বিরুদ্ধে রায় দেন তখন নাক গলানো হয়ে যায়, কাগজে লেখা হলে ষড়যন্ত্র ও বিরোধিদের কুৎসা মনে হয়, কাগজ পুড়িয়ে ফেলার হুমকি দেওয়া হয় আর চক্রান্ত, চক্রান্ত চিৎকার করে মাওবাদীদের বিরাট ভূমিকার কথা বলে প্রতিটি প্রতিবাদকে দমন করার যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে তা শুধু পশ্চিমবঙ্গের নয়, স্বাধীনতার ৬০ বছর পর সেক্যুলার ডেমোক্রেটিক স্টেট নামে মহিমান্বিত ভারতের লজ্জা । সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় বামপন্থী নেতা অশোক মিত্র নিজের প্রবন্ধে (আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৪ নভেম্বর) একথা স্বীকার করে লিখেছেন যে - ..... "এগারো মাস নীরব নিশ্চল থেকে, কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক বিকল্প অনুসরণ না করে, হঠাৎ নতুন ছক কষে, স্বরাষ্ট্র সচিব যা একাধিক বার স্বীকার করেছেন যে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় থাকার নির্দেশ দেওয়া হল,নানা অঞ্চল থেকে ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী জড়ো করা হল, শাসক দলের কর্মীদের দিয়ে চার দিক থেকে নন্দীগ্রামের প্রবেশপথ অবরুদ্ধ, পশু-পাখি-মাছি-সাংবাদিক কারও ঢুকবার অধিকার রইল না।..... নতুন করে ঘরবাড়ি পুড়ল, যাঁরা নন্দীগ্রামের ভিতরে ছিলেন, রক্তগঙ্গা বইয়ে তাঁদের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার পালা শুরু হল । নতুন হতভাগ্য শরণার্থীদের আর্তনাদে আপাতত নন্দীগ্রামের আকাশ মুখরিত"। ....."সত্তরের দশকে রাজ্য কংগ্রেসে সমাজ বিরোধীরা দলের একেবারে উপরের সোপানে পৌঁছে গিয়েছিল। ভয় হয়, মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিরও সেই দশা ঘটবার উপক্রম"। (প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ১৯৭৭ - এর ২১শে জুন জ্যোতি বসুর সাথে যে চার জন শপথ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন শ্রদ্ধেয় অশোক মিত্র।)

দীর্ঘদিন ধরে আরও একটি ব্যাপার কমিউনিষ্ট নেতাদের মধ্যে লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে । এটাই আমরা জানতাম যে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা কখনই কোনো ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেন না এবং ধর্মের উর্দ্ধে গিয়ে তাঁরা মানব কল্যাণকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে মনে করেন । কিন্তু আজ ব্যাপারটা উল্টে গেছে ভোট ব্যাঙ্কের তাগিদে । কংগ্রেসী কালচার গ্রাস করে নিয়েছে কমিউনিষ্ট নেতাদের । হিন্দু ধর্মের গ্রন্থ ও পুরাণ নিয়ে যদি কেউ কটাক্ষ করেন তাহলে কমিউনিষ্ট নেতাদের চোখে সেই মানুষটি প্রগতিবাদী । কিন্তু মুসলিম মৌলবাদ কিংবা তাঁদের গোড়ামো নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন

তোলেন তাহলে সেই মানুষটি কমিউনিষ্ট নেতাদের চোখে সাম্প্রদায়িক হয়ে যাবেন, কারণ তাঁরা চান না ভোট ব্যাঙ্ক ডিস্টার্ব হোক । এক সভ্য সমাজে এ ধরণের রাজনীতির অর্থ হোল জালিয়াতি, তা সে কংগ্রেসই করুক, তৃণমুলই করুক অথবা বামপন্থীরাই করুক না কেন ! হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বা দেব-দেবীদের নিয়ে নানা রকম কটুক্তি বা নোংরা চিত্রাঙ্কণ করা যেতে পারে, কারণ জিজ্ঞেস করলে নেতারা বলেন শিল্পি বা লেখকদের বাক-স্বাধীনতা আছে । কিন্তু মুসলিমদের নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা করলেই মৌলবাদীরা ফতোয়া জারি করে মুন্ডু চাইবেন ও নীরবে এই নেতারা তার সমর্থন করে যাবেন । মানে নিজের দেশে পরাধীন ভাবে বাস করতে হবে, তা সে আপনি যে কেউই হোন না কেন, কারণ নেতারা রাজত্ব চালাবেন তুষ্টীকরণের নীতি নিয়ে আর সবাইকে ওনাদের নীতির সমর্থন করতে হবে নইলে বিপদ । সেক্যুলার কথার অর্থ আজ বদলে গেছে । সেক্যুলার কথার অর্থ হল মুসলিম মৌলবাদকে তোষণ করা ।

এই উপরোক্ত কথাটি প্রায় প্রতিটি রাজনেতারাই মনে প্রাণে বিশ্বাস করে চলেন । যেমন দেখা গেল বৃন্দা কারাটের আচরণে । এই বৃন্দাই রিজওয়ানের মাকে সাহসিকতার জন্য সেলাম জানিয়েছেন আবার অবলীলায় নন্দীগ্রামের সন্তানহারা মা এবং স্বামীহারা নারীদের ওপর দমদম দাওয়াই-এর প্রয়োগ করতে বললেন । এই দুমুখো নীতিতে কি একথা পরিষ্কার নয় যে রিজওয়ানের মায়ের জন্য সহানুভুতি শুধু সংখ্যালঘু ভোটের প্রয়োজনে । এই সি পি এম নেতৃবৃন্দ কিন্তু বরাবর একথা দেশের প্রতিটি জায়গায় বলেন যে সমাজে উন্মত্ততা ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য বিজেপি ভাষণ দেয় এবং বিজেপির ভাষণের পর সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় । আজ তাঁরা নিজেরা কি করলেন। যে মুহুর্তে মনে হল যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে, সাধারণ মানুষ ঘুরে দাড়িয়েছে অমনি বিজেপির সেই চেহারাটা তাদের মধ্যেও দেখা গেল ! আসলে মোদ্দা কথা হল প্রতিটি রাজনৈতিক দলই দায়বদ্ধতা এবং স্বচ্ছতাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে । সরকারের নিজের স্বার্থে দমন নীতি নিন্দনীয়, সেটা গুজরাত হোক মহারাষ্ট্রেই হোক, ওড়িশা, ছত্তিসগড় কিংবা পশ্চিমবঙ্গেই হোক । প্রতিটি আত্মসচেতন মানুষের উচিত সরকারের এই অগণতান্ত্রিক দমন নীতির ও ধূর্ত আচরণের মূল্যায়ন করার। ১৪ই মার্চ পুলিশের গুলিতে যাঁরা নিহত হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে দমদম দাওয়াই প্রয়োগের হুমকি সি পি এম নেতৃবৃন্দের পক্ষেই মানায়। কৃষকের সঙ্গে সংঘাত বাধিয়ে দেওয়া, দলের সঙ্গে যুক্ত বেকার যুবকদের পিস্তল, বোমা, পাইপগান দিয়ে অন্য একদল বেকার যুবকদের রক্তপাত ঝরানো, নির্বিচারে গুলি চালানো, ঘরভাঙ্গা ও জ্বালিয়ে দেওয়া যদি শ্রেণীসংগ্রাম হয়ে থাকে তাহলে একথা আজ পরিষ্কার যে রক্তস্নাত নন্দীগ্রামে ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে । এ দেশে জরুরি অবস্থার সময় শত শত রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা, বিনা বিচারে আটক, কাশীপুর বরাহনগর বারাসাত এর মতো নির্মম গণহত্যাকে হিটলারি ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তুলনা করা যায় । আবার পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতার মদমত্ততায় সি পি এম দলের কার্যপদ্ধতিতে স্বৈরতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদী চরিত্র উন্মোচিত হচ্ছে । শুরু হয়েছে রাজনীতি সন্ত্রাসের নতুন অধ্যায় ।

সমস্ত প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি উপেক্ষা করে, "ওয়ার এগেনষ্ট টেরোরিজম" বলে যেভাবে জর্জ বুশ ঝাপিয়ে পড়েছিলেন ইরাকে সে ছবিটার কথা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে । একদিকে যুদ্ধ আর অন্যদিকে সারা বিশ্বকে জর্জ বুশ শোনাচ্ছিলেন শান্তির জন্য এই যুদ্ধ কেন জরুরি । ঠিক এই দৃশ্যের হুবহু মিল দেখা গেল নন্দীগ্রামে। নন্দীগ্রাম দখল করতে ঝাঁপিয়ে পড়ল শাসকদল প্রতিটি নিয়মনীতি উপেক্ষা করে, অন্যদিকে শোনাতে শুরু করল শান্তির কথা । দেখা যাচ্ছে যে যারা যুদ্ধ বাধায়, তারাই কিন্তু শান্তির কথাটা বেশী করে উচ্চারণ করে । বুদ্ধদেব বাবুর ছিল কায়েমি স্বার্থ ! নন্দীগ্রামকে বৃহৎ বাণিজ্যিক স্বার্থে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির জন্য 'মুক্তাঞ্চল' তৈরী করার চেষ্টা করেছিলেন । 'সেজ' গঠন করার জন্য মরিয়া লক্ষ্যে স্থানীয় মানুষকে গৃহহারা করে বিদেশী বিনিয়োগকারীদের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন । এই পরিকল্পনাটিকে কিন্তু সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন পরিকল্পনা বলা যায় । নন্দীগ্রাম তাই আজ একটি প্রতীক হয়ে দাড়িয়েছে বিশ্বের কাছে, যেখানে সম্রাজ্যবাদী অগ্রাসন এসে ধাক্কা খেল। নন্দীগ্রামের মানুষের জয় তাই সম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের কাছে একটা বিরাট বিপর্যয় । এ জন্যই শাসক দল মরিয়া হয়ে গণহত্যা চালিয়ে সন্ত্রাস

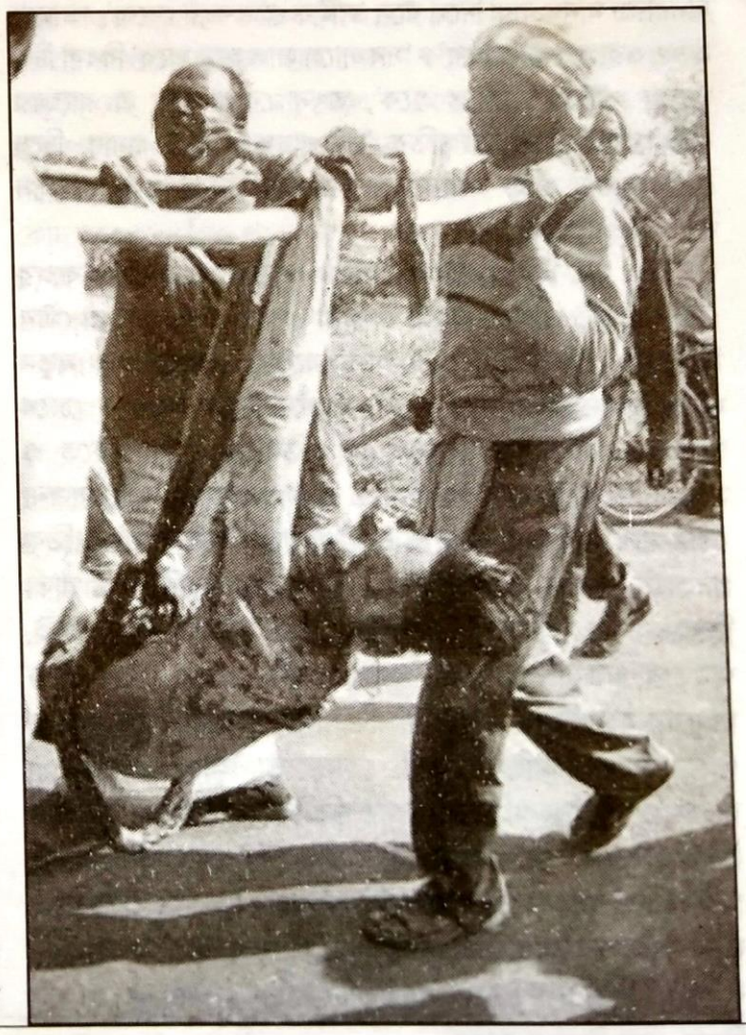

সৃষ্টি করে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছে নিজেদের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করতে চাইছে । একটি রাজ্যের প্রশাসন যখন খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আইন-শৃঙ্খলা প্রতিটি ক্ষেত্রে লজ্জাকর ভাবে ব্যর্থ, শিল্পের নামে দরিদ্র মানুষদের জমি পুঁজিপতিদের বিক্রি করতে থাকে, দীনদরিদ্র মানুষ বাধা দিলে বলে 'লাইফ হেল করে দেবো', 'আমরা ২৩৫ ওরা ৩০ কী করবে' ? 'সব লালে লাল হয়ে যাবে' কিংবা ঢিল ছুড়লে পাটকেল খেতে হবে', তখন বোঝা যায় এ রাজ্যের কর্ণধারেরা কোন সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। এঁরা প্রমাণ দিয়ে ফেলেছেনযে রাজ্য প্রশাসনের অর্থ তাঁরা জানেন না, তাই সে অধিকারও তাঁদের নেই ।

শত ধিক্কার এই সরকারকে । শত নমস্কার পশ্চিমবঙ্গের সেই শতসহস্র সাধারণ মানুষ ও শিল্পী - সাহিত্যিকদের যাঁরা মৌন মিছিলে পথ পরিক্রমা করে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে এক নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন । প্রতিটি রাজনৈতিক দলগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন যে প্রতিবাদের গান গাইতে ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠতে তাঁরাও জানেন, কিন্তু সেজন্য কোন রাজনৈতিক তকমার তাঁদের প্রয়োজন নেই । রাজনৈতিক প্ল্যাকার্ড, স্লোগান ও নেতৃবৃন্দকে ত্যাগ করে একটি স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন যে -ক্ষমতার রাজনীতির প্রতি তাঁদের আস্থা নেই, ক্ষমতার রাজনীতিকে তাঁরা ঘৃণার চোখে দেখেন । শুধু মৌন মানুষের মহামিছিল যে কতটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে-বোধহয় মিছিল নগরী কোলকাতা আগে দেখেনি । স্বতঃস্ফূর্ত সংযত আবেগে দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষকে একই প্রতিবাদ-মঞ্চে টেনে আনা যায় এ দৃশ্য এক অভূতপূর্ব, যা স্মরণীয় হয়ে রইলো । আজ বাংলার গর্ব করার মত কিছু আছে বলে জানা নেই । না আছে বিত্ত, না বৈভব, না সমৃদ্ধ শিল্প, না ব্যবসা-বাণিজ্য । কিন্তু বিশ্ব চেনে এই জাতটিকে শুধু একটাই কারণে, তা হল এই জাতটির আবেগপ্রবণতা ও শিল্প-সংস্কৃতির কাণ্ডারী বলে । ১৪ই নভেম্বর যে বিশাল মৌনমিছিল দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে প্রতিবাদ জানাল, তা রাজ্য সরকার গুরুত্ব দিক-আর না দিক সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা ভারত ও বিশ্বের ঘরে ঘরে পৌছাল এক বিশেষ বার্তা, আর তা হোল অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে অরাজনৈতিক প্রতিরোধী সংগঠন সম্ভব । সেলিব্রিটিদের পাশাপাশি হেঁটে চললেন হাজার হাজার মানুষ, বহুদিন পর কোলকাতা এমন এক মৌন মিছিলের সাক্ষী হয়ে রইল, যে মিছিল দেখে মানুষ বিরক্ত হলেন না বরং স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পায়ে পায়ে হাঁটলেন এই মিছিলের সাথে, নন্দীগ্রামের লড়াকু জনতাকে কুর্ণিশ করা সংগঠনের নামহীন এক ব্যানারের তলায় বিক্ষত হৃদয় নিয়ে ।

বিগত ১৪ই মার্চ নন্দীগ্রামে পুলিশ-সিপি এমের যৌথ নারকীয় অভিযান চলে নিরস্ত্র জনতার উপর । অভিশপ্ত সেই ১৪ মার্চের গণহত্যা ও গণধর্ষণ ভারতবর্ষের মানচিত্রে চিরকাল এক গণতন্ত্রের কালো ও ঘৃণিত দিন হিসাবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে । ১৮ই মার্চ নন্দীগ্রামে যে মেডিক্যাল টিমটি যায় আহত মানুষদের চিকিৎসার জন্য তাঁদের মেডিক্যাল টিমের রিপোর্ট এখানে তুলে ধরা হলঃ—

নন্দীগ্রাম অঞ্চল ঘুরে এসে মেডিক্যাল টিমের রিপোর্ট

গত ১৮ই মার্চ, ২০০৭ রবিবার শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, ডা. ভাস্কর রাও জনস্বাস্থ্য কমিটি, পিপলস্ হেল্‌থ, জনস্বাস্থ্য স্বাধিকার মঞ্চ, পিপলস্ রাইট টু হেল্‌থ ও মেডিক্যাল কলেজ ডেমোক্রাটিক স্টুডেন্টস্ অ্যাসোশিয়েসনের তরফ থেকে ৬জন ডাক্তার (২জন মহিলা ডাক্তারসহ), ৩জন জুনিয়র ডাক্তার, ৩জন সেবিকা ও ২ জন স্বাস্থ্যকর্মীর একটি দল নন্দীগ্রাম, সোনাচুড়া ও গোকুলনগরের অধিকারী পাড়ায় যান — গত ১৪ মার্চ তারিখে পুলিশের আক্রমণ, গুলি-টিয়ার গ্যাস চালনায় আহত মানুষদের চিকিৎসার জন্য । তাঁরা নন্দীগ্রাম স্বাস্থ্যকেন্দ্র গিয়ে চিকিৎসাধীন ৪ জন মহিলার সঙ্গে কথা বলেন । উপরোল্লিখিত অঞ্চলগুলোতে মোট ১২৯ জন আহত মানুষের চিকিৎসা করা হয় । প্রায় ৩০০ জন গ্রামবাসীর সঙ্গে কথাও বলা হয় । মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তার মারফৎ যে যে তথ্য বা ঘটনার কথা উঠে এসেছে তা নীচে

শরণার্থী শিবির — ব্রজমোহন তেওয়ারি হাই স্কুল

সূত্রাকারে দেওয়া হল ।

উল্লেখ্য, স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে প্রদ্যোত মাইতি, বুদ্ধদেব মণ্ডল (প্রতিরোধ কমিটির নেতৃবৃন্দ), প্রভৃতিরা অনেকেই মেডিক্যাল টিমকে প্রচুর সহযোগিতা করেন । সোনাচূড়ায় প্রাথমিক স্কুলে ও অধিকারী পাড়ায় ক্যাম্প করা হয় ও ওষুধ বিতরণ করা হয় ।

এলাকার মানুষদের কাছ থেকে জানা গেছে —

ক)অঞ্চলের বহু মানুষ ১৪ মার্চের পর থেকে নিখোঁজ । মানুষের আশঙ্কা, এঁদের মধ্যে কিছু মানুষ পালিয়ে গেলেও অনেকেই নিহত, গুলিচালনায় ও পরবর্তী আক্রমণে ।

খ)ভাঙ্গাবেড়ার কে. জি স্কুলের ছাত্রসহ বেশ কিছু বাচ্চা সম্পূর্ণ নিখোঁজ । স্থানীয় মানুষদের অনেকেই বললেন প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখেছেন যে বহু শিশুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে । অনেক শিশুর মাথা চপার দিয়ে কেটে ফেলা হয়েছে । মাথা ও ধড়গুলো আলাদা করে বস্তাবন্দী করা হয়েছে ।তারপর, মানুষের ধারণা — হয় ইঁটভাটায় পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে নচেৎ পাথর বেঁধে নদীতে বা বঙ্গোপসাগরে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে । অনেকেরই মতে ভাঙা রাস্তার গর্তে ফেলে পাথর চাপা দেওয়া হয়েছে । অনেকেই বললেন ২-৩ জন ছোট বাচ্চার হাত-পা টেনে ছিড়ে নেওয়া হয়েছে বা তাদের আছড়ে মারা হয়েছে । পরে ঐ সব দেহ মোরামের ট্রাকে পাচার করা হয়েছে ।

গ)তাড়া করে বহু লোককে ঘরে বন্ধ করে পিটিয়ে মারা হয়েছে । আমাদের স্থানীয়বাসিন্দারা ভাঙ্গাবেড়া অঞ্চলের একটা রাস্তা দেখাতে চাইছিলেন,যেখানে এখনও চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে । সিপিএম-এর আক্রমণকারীরা সারা রাত জেনারেটর দিয়ে আলো জ্বালিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করলেও দাগ যায়নি । মাথার ঘিলু মাটিতে মাখামাখি হয়ে আছে । অবশ্য ঐ পর্যন্ত আমরা যেতে পারিনি ।

ঘ)বহু মানুষ ও অল্পবয়সী মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে । বলাই পাল নামে এক কনস্টেবলের ছেলে অপহৃত হলেও পরে তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় । কিন্তু ঐ গাড়িতে আর যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাদের খোঁজ নেই ।

ঙ)পরিবারগুলো ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল । কয়েকটা পরিবারের কোন মানুষই নেই । বহু বাবা, মা, ছেলে বা মেয়ের খোঁজ নেই । আহত হয়ে পড়ে যাওয়ার আগে শেষ তাঁরা প্রিয়জনদের দেখেছিলেন । পরে দেখছেন তাঁরা নিখোঁজ—হাসপাতালে ভর্তি বা মৃত নন । কোন ঘরে দুজন শিশু পড়ে আছে— বাবা- মার খোঁজ নেই ।

চ)বহু কিশোরী বা যুবতীকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । এলাকাবাসীদের মতে নব সামন্ত (সিপিএম-এর নিহত নেতা শংকর সামন্তের ভাই)-এর বাড়িতে মেয়েদের রক্তমাখা কাপড়চোপড়, ওড়না, অন্তর্বাস, চুড়ি বা শাঁখা অনেক পাওয়া গেছে। ওখানে মেয়েদের আটকে রেখে ধর্ষণ করে হত্যা করা হয়েছে বলে মানুষের ধারণা ।

ছ)মৃতদেহ লোপাট করতে লরি ব্যবহার করা হয়েছে । জঙ্গলেও অনেক মৃতদেহ পড়ে থাকতে পারে বলে মানুষ মনে করেন । এছাড়া জলেও ফেলা হয়েছে । ইঁটভাটার পোড়ানো হয়ে থাকতে পারে ।

জ)পুরুষেরা পালিয়ে যাওয়ায় প্রকাশ্য ও দিবালোকে ১০-১৫ জন করে ঘরে ঢুকে ধর্ষণ করেছে । তাদের পরিচিতির ভয়ও নেই । এমনকি এলাকায় সিপিএম প্রতিবেশী ও ভূমিরক্ষা কমিটির কর্মীর স্ত্রীকে ধর্ষণ করেছে (অনেকটা গুজরাটের মতো) । প্রৌঢ়াকে ধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বুক ফালা ফালা করে দেওয়া হয়েছে । ধর্ষিতা হবার ভয়ে ১৬-১৭ বছরের মেয়েরা ব্যাগে জামাকাপড় নিয়ে গ্রামের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে -- বাড়িতে

থাকছে না। এমনই একটি মেয়ে আমাদের সাথে সাথে ঘুরছিল।

ঝ)গুলি চালনার পরে নব সামন্তের পুকুরের ধারে অনেক মানুষ (বেশ কিছু শিশুসহ) পড়ে পুঁটিমাছের মতো ছটফট করছিল। পুকুরের জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের পাথর আর বাঁশ পিটিয়ে মারা হচ্ছিল। এলাকার মানুষ দু'ঘন্টা পরে যখন তাঁদের উদ্ধার করতে গেলেন দেখলেন এক জনও নেই। সব মৃত ও অর্ধমৃতকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ঞ)এলাকার সানি টেলার্স থেকে সিপিএম ২৫০-৩০০ পুলিশের পোশাক বানিয়েছিল। যারা গুলি চালিয়েছে, তাদের গায়ে ছিল পুলিশি উর্দি, অথচ পায়ে রবারের চপ্পল। মানুষের মতে, এরা সবাই ছদ্মবেশী ক্যাডার।

ট)পুলিশ ক্যাম্পগুলো আতঙ্কের উৎস। কারণ ওখানে থেকে ক্যাডাররা হামলা করছিল। সিবিআই ১০ জনকে ধরার পরে ৪০-৫০ জন বন্দুকবাজ (কাঁধে দুটো রাইফেল) এলাকা ছেড়ে পালিয়েছে পুলিশের সামনে দিয়েই। মানুষের আশংকা আবার ওরা ঢুকবে। এলাকাবাসীর মতে মূল পাণ্ডাদের নাম—জয়দেব পাইক, অনুপ মণ্ডল, বাদল মণ্ডল, নব সামন্ত প্রভতি।

ড)খেজুরির দিক থেকেই (তেখালি খালের ওপারে) আক্রমণ চলছে। ১৭ তারিখও সারা রাত কালী পূজোর বাজি ফাটানোর মতো বোমের আওয়াজ এসেছে। এলাকায় এখনও দারুণ আতঙ্ক। রাতে কেউ বাড়ি থাকছেন না, আক্রমণের ভয়ে। মাঠে, পানের বরজের পাশে জেগে শুয়ে থাকছেন। এলাকার মানুষ ৩-৪ রাত ঘুমোননি। মহিলারা লুকিয়ে থাকছেন। নীলিমা দাস গুলি খেয়েছেন হাতে। তাঁর বাবা শ্রীকান্ত পড়ুয়া (মিষ্টির দোকান আছে) বললেন 'হালমা' (বড় রামদা গোছের) দিয়ে বাচ্চাদের মাথা কেটে ফুটবলের মতো লাথি মেরে গর্তে ফেলে চাপা দিয়েছে।

ঢ)কোকুলনগর গাড়া পাড়ায় ১৭ তারিখে রাতেও মেয়েদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। বহু মানুষ দীর্ঘদিন বাজার যেতে পারছেন না, আক্রান্ত বা গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে। চাষবাস বন্ধ। অনেক ঘরেই খাবার নেই।

যা দেখেছি

১।মানুষ ব্যাপক আতঙ্কিত। কিন্তু তাঁরা কঠিনও আছেন। আমরা গাড়ি নিয়ে ঢুকলে প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। পরে আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে দলে দলে এগিয়ে আসছেন এবং সবাই কথা বলতে চাইছেন।

২।প্রায় সকলেরই বক্তব্য ও বর্ণনা এক। বিনা প্ররোচনায় নিরস্ত্র মানুষকে গুলি করা হয়েছে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে গুণ্ডাবাহিনী।

৩।প্রায় ৮০ শতাংশ আহতই মহিলা। বৃদ্ধাদেরও যথেচ্ছ পেটানো হয়েছে। অনেকেই পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখিয়েছেন ৪ দিন

পরেও লাল দাগড়া দাগড়া হয়ে ফুলে আছে । অসহ্য যন্ত্রণা । মাথায় রডের আঘাত । বহু লোক বাচ্চারাও টিয়ার গ্যাসের জ্বালায় চোখে প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছেন ।

৪ ।আমরা ফিরে আসার সময় বহু মানুষ হাত নাড়ছিলেন । হাত জড়িয়ে ধরে আবার আসতে বলছিলেন । তখন তেখালি খালের ওদিকে সিপিএম পতাকাসহ মিছিল করছিল এবং এলাকায় সন্ত্রাস, সৃষ্টিকারী (!) দের হুঁশিয়ারি দিচ্ছিল।

: ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ (Mobile No. : 9830922194)
শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ
সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ঃ
96655 of 1999-2000
(W.B. Society Registration Act)
এইচ. এ-৪৪, সল্টলেক, সেক্টর - ৩
কলিকাতা - ৯৭

১৪ই মার্চ থেকে ১০ নভেম্বর ও তারপরেও নন্দীগ্রামে যা ঘটছে তার কারণে প্রাণে বাঁচতে মানুষেরা আজ আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন কোলকাতা শহরে। নন্দীগ্রামের মানুষেরা এখন কেউই নিজেদের ভিটেমাটিতে নিরাপদ মনে করছেন না । কোলকাতা শহরের বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মানবতাবাদী সংগঠন মিলিতভাবে নন্দীগ্রাম থেকে আসা মানুষদের আশ্রয় দিয়েছেন ও সেব শুশ্রষা করছেন। বিশেষ কারণেই এবং নিরপত্তার জন্য এই সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির নাম উল্লেখ করা হল না ।

শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগের ডাঃ পুণ্যব্রত গুন, যিনি একাধিক বার আহতদের চিকিৎসার জন্য নন্দীগ্রাম ছুটে গেছেন এবং এখনও যাচ্ছেন, "দিনের শেষে"কে জানিয়েছেন এখনও নন্দীগ্রামের অবস্থা ভয়াবহ । এখনও প্রায় সাড়ে চারহাজার শরণার্থী, শরণার্থী শিবিরে (ব্রজমোহন তেওয়ারি হাই স্কুল) রয়েছেন। শিবিরে থাকা শরণার্থীরা বলেছেন যে — "আমরা তো বাড়ি ফিরতে চাই, কিন্তু ফিরলেই অত্যাচার করবে সি পি এম ক্যাডররা"। ডাঃ গুণ এও মনে করছেন যে নন্দীগ্রামের থেকে কোলকাতায় আসার সংখ্যাটা বাড়তে পারে। ওদের চিকিৎসার প্রয়োজন, নিরাপদ আশ্রয়ের সাথে সাথে দুবেলা দু মুঠো অন্নের সংস্থান আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়।

নন্দীগ্রামের এই বীভৎস ঘটনার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে শ্রী বিভূতি ভূষণ নন্দী কাম্বোডিয়ার গণহত্যার নায়ক প্রধানমন্ত্রী পলপটের সাথে বুদ্ধদেবের তুলনা করে নিজের প্রবন্ধটির শিরোনাম দিয়েছেন "পলপটের বুদ্ধবতার"। দৈনিক স্টেটসম্যানের ১৮ নভেম্বরে প্রকাশিত এই লেখাটি প্রতিটি সচেতন ও দায়িত্ববান নাগরিককে পড়ার জন্য অনুরোধ জানাই । শ্রী বিভূতিভূষণ নন্দীর লেখার কিছু অংশ আজ সমাজের প্রয়োজনে, সমাজের জন্য ও সমাজের খাতিরে তুলে ধরার একান্ত প্রয়োজনীয়তা বোধ করে উদ্ধৃত করলাম ঃ—

"কমিউনিস্ট শাসিত বিভিন্ন দেশে দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে ব্যাপক গণহত্যার ইতিহাসে কাম্বোডিয়ার দৃষ্টান্ত স্মর্তব্য । গত শতাব্দীর সত্তর দশকে ওই দেশে ওয়ার্কার পার্টির প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী পলপট-এর আমলে (১৯৭৬-১৯৭৯) যৌথ খামার গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে গিয়ে কম পক্ষে পনেরো লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় । শহরাঞ্চল থেকে মানুষজনকে জোর করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে উঠিয়ে এনে খামারের কাজে নিযুক্ত করা হয় । পুরানো যুগের ক্রীতদাসদের যেভাবে সাধ্যাতীত কাজে লাগানো হত ঠিক সেইভাবে তাদের ব্যবহার করায় এবং দুর্ভিক্ষে কম করেও ১৫ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় । এই ভয়াবহ নরমেধ কাণ্ডের কথা মনে রেখে কাম্বোডিয়ার ওই সময়ের খামারগুলি পৃথিবীর ইতিহাসে বধ্যভূমি হিসাবে পরিগণিত হয়।" একনায়কতন্ত্রে স্ট্যালিন তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য কমিউনিস্ট

পার্টির মধ্যে কোনও ভিন্নমত বা ব্যতিক্রমী কণ্ঠ বরদাস্ত করতেন না। পার্টির মধ্যে তাত্ত্বিক নেতা ট্রটস্কির জনপ্রিয়তা বাড়ছে লক্ষ করে তাঁকে প্রথমে মেক্সিকোতে নির্বাসিত করা হয় ও পরে গুপ্তঘাতক দিয়ে খুন করা হয়। এরকম অনেক গুপ্ত হত্যার ঘটনা স্ট্যালিনের নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটেছিল।

মাও-সে-তুং-এর শাসনকালে লাল চিনে বিপ্লবী শ্রেণীসংগ্রামের স্বার্থে উদারপন্থী বুর্জোয়া ভাবভাবনা থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করা হয়, যা চলে তিন বছর ধরে (১৯৬৬-১৯৬৯)। মাও-এর গ্রেট লিপ ফরওয়ার্ড অভিযানের সময় পার্টির মধ্যে তাঁর দুই প্রতিদ্বন্দ্বী লি সাউ চি এবং দেং সিয়াও পিং-এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্য তথাকথিত সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালু করা হয়। সেই সহিংস ভয়াবহতায় বহু বিপ্লবী নেতা, লেখক, শিল্পী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে স্থানচ্যুত করে-হত্যা করা হয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়। ১৯৮৯ সালে বেজিং-এর টিয়েনিনমান স্কোয়ারে ছাত্র, বুদ্ধিজীবী ও কর্মীদের সমাবেশের উপর মিলিটারি লেলিয়ে দেওয়ায় কম করেও প্রায় তিন হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।

.....পলপট এবং বুদ্ধদের চরিত্রের মধ্যে তুলনা করলে এক জায়গায় মিল ধরা পড়ে। পলপট যেমন লেখাপড়ায় তেমন সুবিধা করে উঠতে পারেননি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও ঠিক তেমনই বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রে তাঁর অপারগতা জাহির করেছেন। বাগবাজারের শৈলেন্দ্র সরকার হাইস্কুলের ছাত্র আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কৈশোর এবং যৌবনের প্রথম কয়েক বছর বখাটে সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে রকবাজি করেছেন এবং আনুষঙ্গিক আরও অনেক কিছু করেছেন, যা না প্রকাশ করাই শ্রেয়। স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল না হওয়া সত্ত্বেও কোনও এক বুদ্ধিজীবীর সহায়তায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বাংলায় সাম্মানিক বিষয় নিয়ে ভর্তি হন কিন্তু একাধিকবার পরীক্ষা ড্রপ করে অতিকষ্টে ৪১ শতাংশ মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হন। আগেই বলেছি যে ফ্রান্সের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে পলপট বিশিষ্ট স্থানে পৌঁছে যান তার কারণ ফরাসি কমিউনিস্টদের কাছে অর্ধশিক্ষিতের কদর ছিল অনেক বেশি। পশ্চিমবঙ্গের মার্কসিস্ট কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও স্বল্প মেধার জয়জয়কার একথা সবাই জানেন। বুদ্ধদেব মুখ্যমন্ত্রী পদ লাভ করেন পার্টির মধ্যে বিদ্বজ্জনের প্রতি বিদ্যামান বিরূপ মনোভাবের কারণে। নিম্নমেধাই তাঁর গ্রহণযোগ্যতাকে অপ্রতিরোধ্য করে তুলেছে। লেখাপড়ায় পলপট পিছিয়ে পড়াদের মধ্যে ছিলেন ঠিকই, কিন্তু ফ্রান্স, রাশিয়া, চিন প্রভৃতি দেশে বহুবার ভ্রমণ করার এবং বাস করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সেই কারণে তাঁর কথাবার্তায় ও ব্যবহারে একজন প্রকৃত সংস্কৃতিবান মানুষের ছাপ ছিল। পলপট চিত্রিত হয়েছেন এভাবে "Polpot is very charming. His face, his behaviour is very polite but he is very very cruel. Polpot is mad, you know, like Hitler." আমাদের সুদর্শন সংস্কৃতিবান মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বসাহিত্য থেকে প্রায়ই তাঁর ভুল ইংরেজিতে কোটেশন আওড়ান। পশ্চিমবাংলার মানুষ তাঁর ইচ্ছামাফিক মনোমতো কাজ না করলে তিনি যখন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেন তখন তাঁর মুখ থেকে মুখোশ সরে গিয়ে আসল চেহারার নগ্ন প্রকাশ ঘটে। আর সে চেহারা কোনও মতেই নয়নসুখকর বা মনমুদ্ধকর নয়। তা দেখে মনে হয়, কথা ও কাজে "He is very very cruel and mad like Hitler."

সিপিএমের ফতোয়া অপর্ণা সেনের উপর

তসলিমার পর এবার অপর্ণা সেনের ফতোয়া জারি করল সি পি এম। আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে সরাসরি হুমকি দিয়ে আন্তর্জাতিক মহিলা ফিল্মোৎসব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে বলা হল চলচ্চিত্র পরিচালক অপর্ণা সেনকে। সল্টলেকের পূর্বাঞ্চল সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে আগামী ৯ থেকে ১৭ ডিসেম্বর ওই উৎসব উদ্বোধন করার কথা অপর্ণা সেনের। কিন্তু সি পি এমের সুভাষ গোষ্ঠী হুমকি দিয়ে আয়োজকদের জানিয়ে দিয়েছে, অপর্ণা সেনকে দিয়ে উৎসব উদ্বোধন করলে ক্ষতি হতে পারে উৎসবের।

অপর্ণার জায়গায় সি পি এমের ডকুমেন্টারি পরিচালক অনিন্দিতা সর্বাধিকারীকে দিয়ে ওই উৎসব উদ্বোধন করার প্রস্তাব দেন সুভাষ চক্রবর্তী। কিন্তু পত্রপাঠ তা খারিজ করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহিলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সোসাইটির (আই ডব্লিউ এফ এফ এস) আয়োজকরা। কারণ তাঁরা মনে করছেন অপর্ণা সেনের সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না অনিন্দিতার। তিনি কয়েকটি ধারাবাহিক পরিচালনার পাশাপাশি এখন নন্দীগ্রাম নিয়ে সি পি এমের প্রচারের জন্য 'উত্তরের খোঁজে' শীর্ষক একটিমাত্র ডকুমেন্টারি বানিয়েই সরকারি বুদ্ধিজীবী তালিকার এক নম্বরে। ওদিকে অপর্ণা সেন নন্দীগ্রাম নিয়ে সরকারি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পথে নেমেছেন বলে সি পি এমের চক্ষুশূল।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েকদিন আগে থেকে আই ডব্লিউ এফ এফ এস আন্তর্জাতিক মহিলা ফিল্মোৎসব আয়োজন করে। এবার তাতে বিধাননগর ফিল্ম সোসাইটি (বি এফ এস) কিছুটা সাহায্য করবে বলে ঠিক হয়েছে। আই ডব্লিউ এফ এফ এস সেমিনার ইনচার্জ সুশান্ত মুখোপাধ্যায় জানালেন, "বি এফ এসের সাধারণ সম্পাদক অংশু শূর এই উৎসব নিয়ে আমাদের পাশে ছিলেন। কিন্তু অপর্ণা সেনকে দিয়ে উদ্বোধন করালে উৎসব আক্রান্ত হতে পারে বলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট থেকে মঙ্গলবারও হুমকি দেওয়া হয়। এদিন সুভাষবাবুর শ্যালক তপন সমাদ্দারের সঙ্গে পরিচালক শ্যামলী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সোসাইটির অন্যতম সদস্য নৃপেন্দ্রনাথ সাহা দেখা করতে গেলে তিনি বলেন, অপর্ণা সেনকে দিয়ে উদ্বোধন করানোটা ঠিক হবে না। আপনারা অনিন্দিতাকে দিয়ে উদ্বোধন করান।" সেখানে সুভাষবাবুর স্ত্রী রমলা চক্রবর্তী এবং সুভাষবাবু নিজেও ছিলেন। রমলা দেবী জানালেন, "ওরা এসেছিলেন তবে এরকম কোনও কথা হয়নি। আমরা অনিন্দিতার নামের প্রস্তাব দিয়েছি কিন্তু অপর্ণাকে উদ্বোধন করতে দেওয়া হবে না এরকম কিছু বলা হয়নি।" অপর্ণাকে চাইছেন না বি এফ এসের সভাপতি বিশ্বজীবন মজুমদার বা সহসভাপতি ইলা নন্দীরাও।

জাপানের পরে সারা বিশ্বে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালকদের ছবির উৎসব এবার তৃতীয় বছরে পড়ল। ৪২টি দেশ থেকে আসছে ১৩৫ টি ছবি। নন্দনে এই উৎসব করার জন্য আবেদন করলেও তা খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের সাহায্যে হাঙ্গেরি, লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি কমিউনিস্ট দেশের ফিল্মও হাজির। ইরানের নামী পরিচালক নিকি কারিমির ছবি 'ফিউ ডেজ লেটার' দিয়ে উদ্বোধন করার কথা উৎসব। যুবভারতীতে অতিথিদের জন্য হোটেলও বুক করা হয়েছে। তবে হুমকির কাছে মাথা নত করছেন না সুশান্তবাবুরা। অপর্ণাকে দিয়েই উদ্বোধন করবেন তাঁরা। অপর্ণাও জানিয়েছেন, তিনি থাকছেন উদ্বোধনে।

(কৃতজ্ঞতা ঃ দৈনিক স্টেটসম্যান)